সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ও নারী জীবন: ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ

পরমাশ্রী দাশগুপ্ত

সার-সংক্ষেপ

প্রাগাধুনিক বঙ্গদেশে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক সহায় সম্বলহীন মেয়েরা বেঁচে থাকার বিকল্প ভূমি খুঁজে পেয়েছিল। সেই ধারা উনিশ বিশ শতকেও অব্যাহত ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের আভিজাত্য এদের ছিল না। দরিদ্র ঘরের মেয়েরা কেউ বা বিধবা হয়ে, কেউ বা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে , আবার কেউ বা কারো দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে , বৈষ্ণব আশ্রমে সেবাদাসী হয়ে অথবা বোষ্টমের বোষ্টমী হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিত। অবিবাহিত কুলীন মেয়েরা প্রাচীন বঙ্গদেশের বৈষ্ণব মেলাগুলোতে তাদের পূর্বজীবন ত্যাগ করে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের সঙ্গী হয়ে উঠত।

সাধনসঙ্গী হিসেবে নারীর এই জীবনে কতটা সম্মান ছিল? নাকি আরো এক অনড়, কঠোর, পুরুষ প্রাধান্যময় ধর্মাচরণের বন্দীশালায় তাদের জীবন আটকে যেত? এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান গবেষণা পত্রটির মুখ্য উপজীব্য। কোন পরিস্থিতিতে,সমাজের কোন শ্রেণির মেয়েরা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাও ঐতিহাসিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এখানে। এই ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নারী জীবনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বহুমাত্রিক দিক অনুসন্ধানই এই গবেষণা পত্রটির মূল অন্বিষ্ট।

চুম্বক শব্দ (key Words)

নারীত্ব, বৈষ্ণব, ঐতিহাসিক, নিম্নবর্গ, ধর্মাচরণ, সহজিয়া, বঙ্গদেশ, সাধনসঙ্গী, পুরুষতান্ত্রিক, বারোমাসী

এক

মা আর মেয়ে। কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনী। সংক্ষেপে দাসী আর মোহিনী। জনু বাজার ও ইলাম বাজারের ন্যাড়া ন্যাড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি বড় আখড়ার অধিকারিণী। কিন্তু লোক চুপিচাপি বলে বৈষ্ণব নটী। কথাটা পরিষ্কার হল না। ছিল ওরা বৈষ্ণবী। মা কৃষ্ণদাসী তরুণ বয়সে নামের দলের সঙ্গে নামগান গেয়ে বেড়াত; ক্রমে ইলামবাজারের ঐশ্বর্যের মোহে আজ নটী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পুরো নটী নয়, নটী পাড়ায় বাস করে না, নটীর সাজে সাজে না, বৈষ্ণবীর মত তিলক কাটে, চূড়া বেঁধে চুলও বাঁধে, দুই বাজারের বাজার-এলাকার বাইরে একটি শান্ত বৈষ্ণব পল্লীতে আখড়াতেই বাস করে; সেখানে প্রভুর সেবাও আছে। তবে এ সমস্তের আড়ালে এদের আর একটি রূপ আছে, সেটি নটীর রূপ।[১]

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কমললতাও আশ্রয় পেয়েছিল এক একনিষ্ঠ বৈষ্ণব আশ্রমে। গ্রাম বাংলায় ঘুরলে এমন অনেক বৈষ্ণব আশ্রম পাওয়া যায় যেখানে কমললতাদের অভাব নেই। তবে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব গুরুদের সান্নিধ্য তারা কয়জনই বা পায়। নারীকে ধর্মীয় সাধনার জন্য ব্যবহার করার ঐতিহ্য আজও ধারণ করে রেখেছে এমন অনেক আশ্রম। আবার আর্থিক কষ্টে অনেক মেয়েই নির্বাচন করে নেয় এক 'নটীর জীবন'। তারা সেখানে সেবাদাসী। কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দ মোহিনীর মত। বীরভূমের লাভপুর থেকে জনুবাজার, ইলামবাজারে ঘুরে বেড়ানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে জন্ম দিয়েছিল আখড়ার অধিকারিনী এই মেয়েদের। *রাধা* উপন্যাসে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বৈষ্ণবী ও নটীর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন কোনো জল অচল বিভাজিকা থাকত না। সেবাদাসী হিসাবে তারা পুরুষ বৈষ্ণবদের যৌন স্বেচ্ছাচারকেই প্রশ্রয় দিতেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যখন সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল তখন থেকেই অবাধ যৌনাচারের জন্যই মূলত এরা সমাজের কাছে অন্ত্যজ, অপাংক্তেয় হতে থাকে। গৃহস্থ বৈষ্ণব ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাজের মূল স্রোত থেকে কিছুটা দূরেই রাখা হত। জাত বৈষ্ণবরাও ছিলেন গৃহস্থ বৈষ্ণব। H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' বইতে বৈরাগী – বোষ্টমদের থেকে জাত বৈষ্ণবদের আলাদা করে রেখেছেন।[২] বৈষ্ণবদের মধ্যে সব থেকে অপাংক্তেয় ও ঘৃণ্য ছিলেন এরাই। অথচ বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করে, বোষ্টমের বোষ্টমী হয়ে এই সমস্ত সহায় অবলম্বনহীন মেয়েরা বেঁচে থাকার বিকল্প ভূমি খুঁজে পেয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নাটকে

প্রহসনে গড়িয়ে ছিল এদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালম্বীদের আভিজাত্য এদের ছিল না। বৈরাগী বোষ্টমরা যেহেতু সমাজের মূল ধারার একেবারে বাইরে ছিল তাই তাদের অবাধ যৌনাচারী, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলে সমাজ তকমা এঁটে দিয়েছিল। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিম্নবর্ণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। যৌনকর্মীরা বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় পেয়েছিল। বাইতি, ভুঁইমালী, ধোবা, দোয়াই, ডোম, গঁড়ি, জেলে- কৈবর্ত, মালো, কাঁদরা, পোঁদ, শুঁড়ি, তিয়র প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। সমাজের সে স্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীরা যেতেন না সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন লালন ফকির, সিরাজ সাঁই, পাবনার শম্ভু চাঁদ, কর্তাভজাদের গুরু লালশশী, বিক্রম পুরের সুধারাম বাউল, রং পুরের রূপচাঁদ গোঁসাই, ফকির পাঞ্জ শাহ এবং ঠাকুর হরিচাঁদ।

অজ্ঞাত বৈষ্ণবরা বাইতি, ভুঁইমালী, ধোবা, দোয়াই, ডোম, গঁড়ি, জেলে-কৈবর্ত, মালো, কাঁদরা, পোঁদ, শোরি, তিয়র প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। কোনও কোনও গোঁসাই যৌনকর্মীদেরও মন্ত্র দিয়েছিলেন। পাদ্রি ওয়ার্ড লিখেছিলেন – "At Calcutta nearly all the women of ill-fame profess the religion of Choitunyu before their death, that they may be entitled to some sort of funeral rites." [৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পতিতারা অনেকে মৃত্যুর পর তাদের সঞ্চিত টাকা পয়সা উইল করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মন্দিরে দান করে যেতেন। এই সমস্ত প্রাচীন দলিল ঐতিহাসিক রমাকান্ত চক্রবর্তীকে দেখিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ইতিহাস অনুসন্ধানী অমিত রায়। সমাজে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মেয়েদের অবলম্বন হয়েছিল বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণব ধর্ম তাদের ধর্মাচারণের অধিকার, নিজস্ব পরিচয় দিয়েছিল। মৃত্যু পরবর্তী শেষকৃত্যটুকু এই ধর্মীয় মতেই সমাধা হত। প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মূল্যবোধকে অস্বীকার করে তাদের বিপরীতে এরা বৈষ্ণব সাধনার এক ভিন্নমুখী স্রোত তৈরী করলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে কর্তাভজাদের দলে, এবং নিম্নবর্গীয় একাধিক সম্প্রদায়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার চেতনা সুস্পষ্ট ছিল।

দরিদ্র ঘরের মেয়েরা কেউ বা অকাল বৈধব্য, কেউ বা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে আবার কেউ নিজের নিকট জনের থেকে প্রবঞ্চিত হয়ে আশ্রয় পাওয়ার জন্য, মুক্তির সন্ধানে আশ্রমে সেবা দাসী বা গুরুর চরণ দাসী হিসাবে জীবন কাটাতেন। হয়তো তাদের খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থান জুটে যেত। আর্থিক অনটনে, সমাজের নিপীড়নে মরতে হত না কিন্তু যে জীবনকে তারা গ্রহণ করেছিলেন সেখানে কী প্রকৃতই তাদের মুক্তি ঘটেছিল? নাকি আরো এক অনড়, কঠোর, পুরুষ প্রাধান্যময় বন্দীশালার মধ্যে তারা নিজেদের নিক্ষেপ করেছিল। গুরু সান্নিধ্যে থাকার ফলে মেয়েটিকে হয়তো কোন সামাজিক কৈফিয়ৎ দিতে হতনা। গুরুর আশ্রমের অনেক অসামাজিক কাজই ধর্মীয় মোড়কে ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু ধর্ম সাধনার উপায় এই মেয়েদের জীবনে প্রকৃত মুক্তি কোনো অবস্থাতেই আসেনি। যুগ পেরিয়ে যায় মেয়েরা ব্যবহৃত হতেই থাকে। রাধা বা কমললতাদের সময় পেরিয়ে আজও এ বাস্তবতা অনড়। দরিদ্র পরিবারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মেয়েদের এমন সিদ্ধান্ত নিতে শেখায় অথবা তাদের ঠেলে দেওয়া হয় এক ধর্মীয় কারাগারে আত্ম বিসর্জন দিতে।

দুই

নারী পুরুষের মিলিত গুহ্য সাধন প্রণালী ও ধর্ম সাধনার ধারা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে বহুদিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতি হিসাবে বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। পাল রাজাদের সময়ে বাংলা দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে যে গুহ্য সাধন পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল সেই সাধনা এবং হিন্দু তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি মূলত একই ছিল। সহজ সাধনার অন্তর্গত বাহ্য সাধনায় নারী সঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেন রাজাদের সময় থেকে বঙ্গদেশে রাধা-কৃষ্ণ সম্বলিত বৈষ্ণবধর্মের প্রসার হতে থাকে বলে মনে করা হয়। এই বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের পরে আগের গুহ্য সাধন পদ্ধতি বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং এই ভাবেই বৈষ্ণব সহজিয়া মত গড়ে ওঠে।

নর-নারী পরস্পর মিলিত এই ধর্ম সাধনা বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মধ্যে এমনকি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যা ছিল মূলত যোগ সাধনা। বৈষ্ণব সহজিয়ার ভিতরে তা প্রেম সাধনায় রূপান্তরিত হল।[৪]

চৈতন্য পরবর্তীকালে যতই সময় এগিয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদ ততই সমাজে গ্রহণীয় ও প্রচলিত হয়ে উঠেছে। বর্ণ বিভাজিত হিন্দু সমাজের কঠোর বিধানের বিপ্রতীপে বৈষ্ণব সহজিয়া মত সমাজে জনপ্রিয় হয়। সহজিয়া সাধনায় প্রেম সাধনার পক্ষে উপযুক্ততম নায়িকা হলেন পরকীয়া নায়িকা। সহজিয়ারা মনে করেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সকলেই বিশেষ কোনো পরকীয়া নায়িকার সঙ্গে সহজ–সাধনা করেছেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়াদের অনুরূপ ভাবে 'কিশোরী ভজনের' একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়াদের অনুরূপ ভাবে পুরুষে কৃষ্ণের আরোপ ও স্ত্রীতে কিশোরীর (রাধার) আরোপ করে সাধনার প্রথা প্রচলিত। পরকীয়াতত্ত্ব রূপান্তরিত হল নায়িকা সাধনাতে। 'চূড়াধারী', 'বাউল', 'বাওলা', 'শিষ্যাবিলাসী', 'কিশোরী ভজন', 'সহজ' প্রভৃতি গুরুবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হল ক্রমেই। জাহ্নবাদেবীর পালিত পুত্র রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট, বাঘনাপাড়াতে যে পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব *মুরলীবিলাস* এবং *বংশীশিক্ষা* গ্রন্থ দুটিতে দেখা যায় তাও সহজিয়া তত্ত্বের ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ইঙ্গিতবাহী । রাজবল্লভ গোস্বামীর *মুরলীবিলাস* গ্রন্থটিতে জাহ্নবাদেবীর মতবাদ অর্থাৎ বৈধী ভক্তির কথাই বর্ণিত হয়েছে কোথাও সহজিয়া মত নেই। আবার ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রেমদাসের *বংশীশিক্ষা* গ্রন্থটিতে সহজিয়া মত বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশিত। এর কারণ মনে করা যেতে পারে অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বর্ধমানে সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রভাব। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ছিলেন বৈষ্ণব তত্ত্বে পরকীয়াবাদের সমর্থক। তিনি *উজ্জ্বলনীলমনি*-র 'লঘুত্বমত্র' শ্লোকের টীকায় জীব গোস্বামীর স্বকীয়াবাদের উপর ঘোরতর আক্রমণ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ "সিদ্ধান্ত চন্দ্রোচয়"-এ পরকীয়াতত্ত্বের উপর আলোকপাত করেন । এই সময় পরকীয়াবাদকে ব্যাখ্যা করে আরো অনেক তত্ত্ব গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে বঙ্গদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পরকীয়াবাদ বহুল ভাবে প্রচারিত হতে শুরু করে।[৫]

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে প্রথম পর্যায় থেকেই পরকীয়াবাদ এত বিস্তার পায়নি। যদিও *চৈতন্য চরিতামৃত*–এ বলা হয়েছে –

পরকীয়া- ভাবে অতি রসের উল্লাস ।

ব্রজ বীনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ।।[৬]

তবুও পরকীয়া সাধনা কিন্তু ব্রজধামে সীমাবদ্ধ ছিল না। বেশ কিছু সংখ্যক বৈষ্ণবরা তাদের জীবনে পরকীয়া সাধনাকে পরখ করতে চেয়েছিল। এই কারণেই বৈষ্ণবধর্ম সব থেকে বেশী সমালোচিতও হয়েছে। মধুরভাবকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রেষ্ঠ ভাব বলেছিলেন। এই মধুরভাবে পরকীয়া সাধনার চরম গুরুত্ব থাকায় তা সামাজিক ক্ষেত্রে বিপদজনক হতে পারে বলে আন্দাজ করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গরাই। নিত্যানন্দ সাধারণ মানুষের জন্য 'সখ্য' ও 'দাস্য' ভাব প্রচার করেছিলেন। মধুর ভাব প্রচার করে বাংলায় ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলা বিভিন্ন কারণে সম্ভব ছিল না এটা দক্ষ সংগঠক নিত্যানন্দ বুঝেছিলেন। চৈতন্যদেবেরও সম্ভবত এই ধারণা ছিল তাই তিনি মধুরভাবের প্রচারক তাঁর অতিপ্রিয় নরহরি সরকারের উপর বঙ্গে ভক্তি প্রচারের দায়িত্ব না দিয়ে সে দায়িত্ব দিয়েছিলেন নিত্যানন্দকে।

চৈতন্যদেব জীবিত থাকাকালীনই বৈষ্ণবরা নানা গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীতে ভাগ হতে থাকে। এদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠীই সহজ সাধনার পক্ষপাতী ছিল। সহজিয়ারা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। নিত্যানন্দ ও নরহরির গোষ্ঠী বাংলায় সবথেকে শক্তিশালী বৈষ্ণবীয় গোষ্ঠী হয়েও সহজিয়াদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি।

সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার নানা কারণ ছিল। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তার গোষ্ঠীর দায়িত্ব ভার নেন জাহ্নবাদেবী। জাহ্নবার নেতৃত্বের গুনে নিত্যানন্দের গোষ্ঠীতে কোন ভাঙ্গন ধরেনি। জাহ্নবা বৃন্দাবনে গিয়ে গোস্বামীদের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করে ভক্তি আন্দোলনের বঙ্গীয় ও বৃন্দাবনী ধারার মধ্যে সংযোগ রাখতে চেয়েছিলেন । এক্ষেত্রে জাহ্নবার সহযোগী হয়েছিল সেই সময়ের বঙ্গদেশে তিন অঞ্চলের তিনজন প্রভাবশালী বৈষ্ণব নেতা শ্রীনিবাস আচার্য , শ্যামানন্দ এবং নরোত্তম দত্ত। জাহ্নবা বৈধিভক্তি ও স্বকীয়া মতবাদের

প্রচারক ছিলেন। জীব গোস্বামীও তাত্ত্বিক ভাবে স্বকীয়া মতবাদকেই সমর্থন করেছিলেন। চৈতন্য–নিত্যানন্দ পরবর্তী বঙ্গে শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দাস ও জাহ্নবারা ভক্তি আন্দোলনের বৃন্দাবনী ধারার সঙ্গে সংযোগ রেখে তত্ত্ব প্রভাবিত যে বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে তোলেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষ ক্রমশই সংযোগ হারায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের একাধিপত্যের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হয়। নীচু স্তরের বৈষ্ণব গুরুরা সহজিয়া মতের দিকে ঝোঁকে। সাধারণ মানুষদের মুক্তির কথা, তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতারা আর তেমনভাবে ভাবেননি। চৈতন্য-নিত্যানন্দের যেমন জন সংযোগ ছিল, জনগণের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল, এঁদের তেমন ছিল না। নির্দিষ্ট অঞ্চলের অভিজাত মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা অনেকেই বিলাসী জীবনযাপন অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ভক্তি আন্দোলনের সূচনার মূল লক্ষ্য থেকে পরবর্তী আন্দোলনের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের মোটামুটি একশো বছরের মধ্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ জাঁকিয়ে বসেছিল। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর *হরিভক্তি বিলাস* ব্রাহ্মণ্যবাদকে সমর্থন জানায়। সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় শূদ্রের কাজ উচ্চবর্ণের সেবা করা। এই গ্রন্থ হিন্দু সমাজের বর্ণভেদকেই সমর্থন করেছিল।[৭]

ষড় গোস্বামী প্রচারিত যে বৈষ্ণবীয় দর্শন পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়েছিল তার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যের কোন মিল ছিলনা। তাদের মতবাদ চৈতন্যদেবের মতামতের বিপরীতমুখী ভাষ্য ও বলতে চেয়েছেন অনেক সমালোচক। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মকে তারা নানা ভাবে এড়িয়ে গেছে। বৈষ্ণবধর্মকে শাস্ত্র সম্মত করতে গিয়ে তাঁরা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে ক্রমাগত শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের যোগ খুঁজেছেন। লোক উপাদান বর্জন করে সামাজিক মুক্তির পথ থেকে সরে এসেছেন। চৈতন্য আন্দোলনে লোকায়ত ভাবনা পরিত্যক্ত হয় এর মধ্যে ক্রমেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে লোকজীবন থেকে এই ব্রাহ্মণ্য আন্দোলন অনেকটা দূরে সরে যায়। সাধারণ মানুষ এই ধর্ম চেতনার মধ্যে নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে ক্রমশ সহজ সাধনায় আগ্রহী হয়ে পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের থেকে নানা উপসম্প্রদায় আলাদা হতে থাকে। তাদের নির্দিষ্ট সাধনপন্থা ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে এই ধারাগুলি আত্মসমর্পণ করেনি। বরং কঠোর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিপ্রতীপে এই ধারাগুলি মানুষকে অন্যরকম ভাবে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছিল।

বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে এই বিভাজন বেশি প্রকট হতে থাকে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে আবলম্বন করে একটি গোষ্ঠী সমাজের সাধারণ মানুষদের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উপনিবেশ পূর্ব নারী প্রগতি ও নারী শিক্ষার ধারার সূত্রপাতও এখানেই। নারী বৈষ্ণব গুরু হিসাবে এগিয়ে আসেন এবং বৈষ্ণব পরিবারগুলোতে মেয়েদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বর্ণবাদ, অর্থনীতি, শিক্ষা বৈষ্ণবদের মধ্যে এক ধরনের আভিজাত্য এনে দেয় এবং তাদের জনজীবন থেকে আলাদা করে দেয়।

তিন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে আভিজাত্য, বর্ণবাদ পোষণ নীতি থেকে ক্রমেই দূরে সরতে থাকে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলি। আখড়ায়, আশ্রমে থাকা বৈষ্ণব ও ভবঘুরে বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া সাধন পদ্ধতি বেশি প্রচলিত ছিল। 'বৈরাগী-বোষ্টম' বলে এক ধরনের ভিক্ষাজীবী ভবঘুরে বৈষ্ণব ছিল। গোড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এদের কোনদিনই তেমন ভাবে গ্রহণ করেনি। 'বৈরাগী-বোষ্টম' সম্প্রদায়ের উদ্ভবও সামাজিক কঠোরতা ও দারিদ্রের প্রত্যক্ষ ফল। গৌড়ের রামকেলি বর্ধমান জেলার দধিয়া বৈরাগী তলা, পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছে লাঙ্গল বন্ধ ও রাজশাহীর খেতুরির মেলার 'প্রেমতলী'তে বৈরাগী রোষ্টমরা ফৌজদারের হাতে পাঁচসিকা দক্ষি ণা দিয়ে বোষ্টমী জোগাড় করতেন। এই বোষ্টমী কারা? বিধবারা, স্বামী পরিত্যক্ত মহিলারা অভিভাবকহীন যুবতী এবং কুলীন সমাজের অবিবাহিত দুর্ভাগা মেয়েরা। প্রায় কয়েকশো বোষ্টমী প্রেমতলীতে বসে থাকতেন তাঁদের হাত পা ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকত। এই হাত পা দেখেই বোষ্টমকে বোষ্টমী নির্বাচন করে নিতে হত। মনে রাখা দরকার বোষ্টমের বোষ্টমী নির্বাচনের অধিকার ছিল, বোষ্টমীর বোষ্টম নির্বাচনের নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যাবতীয় প্রাধান্য শুধু পুরুষেরই তাই বোষ্টমীর বোষ্টম নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। বোষ্টমরা জোগাড় করতেন তাদের সাধনসঙ্গী।

গৌড়ের রামকেলিতে চৈতন্যের বিশ্রামস্থল তমালতলার কাছেই একটি বিরাট ঘর আছে স্থানীয় মানুষদের কথা অনুযায়ী এই ঘরেই নাকি বোষ্টমীরা জড়ো হতেন এবং দেওয়ালের কিছু ফাঁক ফোঁকর দিয়ে তারা হাতটা বার করে রাখতেন। বোষ্টমকে এই রকমই কোনও একটি হাত ধরতে হত। তাঁদের মধ্যে কণ্ঠী বদল করে বিবাহ হতো এবং ইচ্ছা হলে বোষ্টমী এক বছরের মধ্যে বোষ্টমকে ত্যাগও করতে পারতো। কিন্তু বোষ্টমীরা বোষ্টম ত্যাগ করতে

পারতো কিনা এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়না। এই বোষ্টমীদের বলা হত 'পাঁচ সিকার বোষ্টমী'।[৮] বোষ্টমদের কেউ কেউ আখড়া বাসী ছিলেন আবার অনেকে রাস্তায় ভিক্ষে করে দিন কাটাতেন। হয়তো স্বপ্ন দেখতেন কিছু টাকা পয়সা হলে তারাও গৃহস্থ হবেন বা তাদেরও নিজস্ব আখড়া হবে। এদের যেমন কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না তেমনই আর্থিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। যাঁদের 'প্রেমতলী'র বোষ্টম বোষ্টমী রূপে দেখা হয়েছে, নিন্দা করা হয়েছে, সামাজিক ভাবে ঘৃণা করা হয়েছে তাঁদের অসহায়তার দিকটাও বুঝে নেওয়া দরকার।

ক্ষিতিশ চন্দ্র মৌলিকের 'ভরার মেয়ের গানে'র ভূমিকার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় এই বোষ্টমীরা অনেকেই ছিলেন কুলীন ঘরের মেয়ে। যাদের পাত্রস্থ না করতে পেরে অভিভাবকেরা ঘটকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নৌকা করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাদের নিয়ে যাওয়া হত । বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় মেলায়, আখড়ায় যাদের বিক্রি করে দেওয়া হত। এই সমস্ত মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য না দিয়েছিল পরিবার, না দিয়েছিল সমাজ। সম্পূর্ণ অন্যের ইচ্ছায়, চূড়ান্ত অসহায়তায় তারা নিজেদের বিকিয়ে দিতে বাধ্য হতো। বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্র নির্ধারিত চূড়ান্ত সামাজিক কঠোরতা জাতিভেদ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই বোষ্টমী সম্প্রদায়। যারা অনেকটা বোষ্টমদের হাতের পুতুল মাত্র ছিল। যে বোষ্টম তাদের এক বছরের জন্য কণ্ঠীবদল করে বিবাহ করতেন। তাদের সঙ্গে দিনযাপন করতে, তাদের সাধন সঙ্গী হতে এরা কিছুটা বাধ্যই হতেন অন্যদিকে বোষ্টমরা এক বছর পর ইচ্ছে মত এদের পরিত্যাগ ও করতে পারতেন।

আবার শুধু ভরার মেয়েরাই নয় অনেক সমাজ পরিত্যাক্ত বিধবা, অবলম্বনহীন মেয়েদেরও আশ্রয় দিয়েছিল এই সব আখড়া। সমাজের প্রথাগত স্রোতে যারা বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু পায়নি সেই সব মেয়েদের আশ্রয় ও অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৈষ্ণবীয় আখড়াগুলি। অনাথ, পরিত্যক্ত মেয়েদের জন্য সেই সময়তো সরকারী আশ্রম বা কেন্দ্র ছিল না। বোষ্টমী হয়ে অন্তত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান জুটে গিয়েছিল তাদের।

বল্লাল সেনের সময় থেকেই কৌলীন্য প্রথা সমাজে তেমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেনি। কৌলীন্যও সম্ভবত প্রথমে মর্যাদা সূচক উপাধিমাত্র ছিল। কালক্রমে তা বংশগত হয়ে উচ্চতম সামাজিক শ্রেনির চিহ্নে পরিণত হয়।

ছাপ্পান্ন গাঁই ব্রাহ্মণদের মধ্যে আঁটটি গাঁই হল – বন্দ্য, চট্ট, মুখটি, ঘোষাল, পুততুণ্ড, গাঙ্গুলি , কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী। বল্লাল সেন ঘোষিত নয়টি গুণের পূর্ণ অনুশীলন করেই ব্রাহ্ম ণরা 'কুলীন' ব্রাহ্ম ণের মর্যাদা লাভ করেন। নয়টি গুণ হল আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ পর্যটন, নিষ্ঠা, বৈবাহিক আদান প্রদান, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান। বল্লাল সেন এই আট গাঁই এর মধ্যে বিবাহের কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি । কিন্তু বল্লাল সেনের কয়েকশো বছর পর দেবী বর ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণদের দোষ বিচার করে শ্রেনি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দেবীবর ঘটক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুলীনদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরো প করেন। ফলে বৈবাহিক আদান প্রদানের ক্ষেত্র কুলীনদের সংকুচিত হয়ে যায়। কুলীন পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ ব্যাপক রূপে প্রচলিত হয়। নিষ্কর্মা কুলীন পুরুষদের বিবাহ ব্যবসা শুরু হয় অন্যদিক কুলীন ঘরে পাত্রস্থ না করতে পারা অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অবিবাহিত মেয়েদের ঘরে রাখার গুরভার মুক্ত হওয়ার জন্য অভিভাবকেরা ঘটকের হাতে মেয়েদের তুলে দেয়। যতই তিল-তুলসী-গঙ্গা জল ছুঁয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেওয়া হোক এই প্রতিশ্রুতি যে কত ভঙ্গুর তা কী অভিভাবকেরা জানতেন না? তাদের কাছেও তো ঘটকদের অর্থ পিপাসু ব্যবসায়ী রূপটি স্পষ্ট ছিল। এভাবেই কুলীন মেয়েরা সোজা কথায় বিক্রি হয়ে যেত দেশে দেশান্তরে। তাদের অনেকের আশ্রয় হত বৈষ্ণব মেলার প্রেমতলীতে। অনেকেই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরুর সেবাদাসীতে পরিণত হতেন। অনেকেই হতেন বোষ্টমের এক বছরের বোষ্টমী। বঙ্গীয় সমাজে নারী পাচারের প্রাচীন দৃষ্টান্ত এটি। অষ্টাদশ – উনিশ শতকে যা ব্যাপক রূপ নিয়েছিল।

চার

ক্ষিতিশ চন্দ্র মৌলিক 'ভরার মেয়ের গান' [৯]- এর যে ভূমিকা লিখেছেন সেখানে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন ভরার মেয়ে সংক্রান্ত তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন মূলত তিনটি উৎস থেকে।

ক. বাল্যকালে পিসীমা ও অন্যান্য বৃদ্ধার মুখে শোনা ভরার মেয়ের কথা। যা প্রাপ্ত বয়সে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন।

খ. ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট ঘটক পরিবারের সঙ্গে সখ্যতা এবং তাদের পুরোনো খাতাপত্র থেকে ভরার মেয়ে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ।

গ. মধ্য, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি বনিয়াদী গোস্বামী বংশের ‘পাঠ বাড়ী’ থেকে সংগৃহীত তথ্য।

অর্থাৎ ভরার মেয়ের গান এবং ভরার মেয়ে সম্বন্ধীয় নানা গল্পকথা মহিলাদের মধ্যে পরম্পরায় বাহিত হয়ে চলেছিল। অথচ ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিকের সংগৃহীত গান ছাড়া উনিশ বিশ শতকের অন্য কোনো সাহিত্যে ভরার মেয়েদের সম্বন্ধে তেমন কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি। তার কারণ কী শুধুই শিক্ষিত ভদ্র সমাজের উদাসীনতা না সমাজের মূল স্রোতের বাইরে বিকল্প কোনো গোপন স্রোতে এই মেয়েদের ইতিহাস নির্মিত হয়ে চলেছিল। যার সন্ধান পাওয়া সহজ ছিল না। নন্দিতা বসু উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রশান্তকুমার মহলানবিশের পিতা গুরুচরণ মহলানবিশের আত্মজীবনীর শুরুতেই এক ভরার মেয়ের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।[১০] সেই সময়কার ঘটক পরিবারের সঙ্গে ভরার মেয়েদের যোগাযোগ এবং একই রকমের সংযোগ ছিল বনেদী গোস্বামী বংশের পাটবাড়িগুলির সঙ্গে। অর্থাৎ অবক্ষয়িত বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে উচ্চ শ্রেনির হিন্দু সমাজের কৌলীন্য প্রথার ফসল ভরার মেয়েদের কথা। হিন্দু সমাজের পরিত্যক্ত মেয়েদের পুনর্বাসনের জায়গা হয়েছিল বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলি । কুলীন ঘরের কন্যা যাদের বিবাহ দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য অভিভাবকদের ছিল না এবং স্বামী পরিত্যক্ত মেয়েরা যাদের নামে মাত্র বিয়ে হয়েছিল, স্বামী ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না তাদেরকে ‘তামা-তুলসী-গঙ্গাজল’ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ভরার ঘটকের হাতে তুলে দেওয়া হত। এই প্রতিজ্ঞা ছিল উপহাস মাত্র। কিছুদিন পর জীবিত মেয়ের ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে অভিভাবক জানিয়ে দিতেন, দূর সম্পর্কীয় কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। এই ভাবে নিজেদের মেয়েদের পাচার করে কুলীন ব্রাহ্মণরা নিজেদের কৌলিন্য বজায় রেখেছিল বহু শতাব্দী ধরে।

> এই ভরার ঘটক গোষ্ঠী বিবাহের বাজারে সমাজ বন্ধন প্রাচীরের তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটিয়া রাত্রের অন্ধকারে কুলীন সমাজে বাড়তি কন্যা পাচার করিয়া দিবালোকে অকুলীন বাজারের ঘাটতি পূরনের ব্যবসা প্রায় তিনশত বৎসর চালাইয়াছিলেন।[১১]

গোস্বামী প্রভুদের শ্রীপাটে শিষ্য-ভক্তদের বিধবা কন্যা জমা দেওয়ারও রীতিও ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন মোহন্তদের পরিচালনায় যে সমস্ত আখড়াগুলো তৈরি হয়েছিল সেখানেও ভরার মেয়ে ও বিধবা মেয়েদের জমা দেওয়া হত। 'টহলিয়া বাবাজী'রা মহন্তের অধীনে থেকে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতেন এবং অনাথ বিধবা মেয়েদের খোঁজ খবর রাখতেন। প্রয়োজনে তাদের বৈষ্ণবীয় আখড়ায় নিয়ে আসতেন। গোস্বামী প্রভুদের শ্রীপাটে এদের কণ্ঠী বদল করে বিবাহ করা চালু ছিল। এই রকম বিবাহে জাতিভেদ, মেয়েটি অবিবাহিত না বিধবা কিছুই গ্রাহ্য করা হত না। যে সমস্ত মেয়েদের দোল পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহ দেওয়া সম্ভব হত না তাদের আনা হত খেতুরী, রামকেলী, ধামরাইয়ের বৈষ্ণব মেলায়। যারা অতি অল্প ব্যয়ে সঙ্গিনী সংগ্রহ করতে চাইতেন তারা গোস্বামী গদীতে নির্দিষ্ট অর্থ জমা দিয়ে অনুমতি পত্র নিতেন। একে বলা হত 'পত্রী করা'। গদীর সামনে সার্কাসের তাবুর মত ঘর করে যেখানে মেয়েদের রাখা হত সেই ঘরের নাম ছিল 'কাণ্ডারী'। কাণ্ডারীর ছড়িদারের হাতে পত্রী জমা দিলে তারা মেয়ে পছন্দ করার সুযোগ পেতে ন। পূর্বেই বলা হয়েছে শুধু হাতের আঙ্গুল দেখে তাদের সঙ্গিনী পছন্দ করতে হত। মেলার শেষেও যাদের গ্রাহক জুটত না তাদের নীলামে বিক্রি করা হত। ধনী গৃহে তারা গৃহদাসী হিসাবে ক্রীত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মনুষ্য বিক্রয় পত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্রের গানে পাই খাজনা মেটানোর জন্য দরিদ্র কৃষক লাঙ্গল হাল বিক্রি করার পর দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকেও বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। মনুষ্যত্বের অবমাননার এই ধারাবাহিক ইতিহাসের শরীক ছিল ভরার মেয়েরা।

ভরার মেয়েদের গান যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখবো নিষ্ঠুর সামাজিক বিধানকে তারা তাদের দুর্গতির জন্য দায়ি করেছে। অভি ভাবকেরা তাদের প্রতি দয়াহীন, মমত্বহীন হয়েছে এই সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে। টাকা পয়সা দিয়ে নতুন যে মানুষটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সেখানে যে সুখ নেই, সেই রীতি যে সে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি তা বোঝা যায় নানা উক্তি থেকে।

যেমন –

ভরা পাড়া ঘটক রে,

আরে ঘটক ট্যাকাকড়ি খাইয়া।

বৈদেশে গাবরের ঘরে

আমারে দিছে বিয়া। [১২]

এই বিবাহিত জীবনের প্রতি ধিক্কার ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে। -

যাইও যাইও যাইওরে নাইয়া
আমার বাপের বাড়ীত যাইও।
অভাগী কইন্যার কথা
বুঝাইয়া কইও।।
পরানে না বাঁচিব রে আমি
এই বেবানে পড়িয়া।
ও উজান দেশের নাইয়া। [১৩]

ভরার মেয়েদের নিজেদের মতামতের কোনো গুরুত্ব ছিলনা। তাদের অভিমতের অপেক্ষা না রেখে হস্তান্তরিত করা হত তাদের। জীবনের এই নিষ্ঠুর পরিণতিতে তাই তাদের অন্তর পাথর হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ভরার মেয়ের বারোমাসীর মধ্যেও তাদের ফেলে আসা পূর্বজীবনের সুখ স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। আর এসেছে কোনোদিন পিতৃগৃহে না ফিরতে পারার অশ্রু ভেজা দীর্ঘশ্বাস। পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আত্মার আক্ষেপ। সত্যবতী গিরি অনুমান করেছেন এ সৃষ্টি অনাম্নী কোনো অন্তঃপুরিকার। [১৪] এর তেমন কোনও প্রমাণ না থাকলেও এ কথা বলাই যায় যে অভাগী মেয়েগুলোর মুখে মুখেই পরম্পরায় বাহিত হয়েছিল এই গান। ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক লিখেছেন শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় এমন অনেক গান ছড়িয়ে আছে। যা তাঁর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বোঝা যায় এমন দুর্ভাগা মেয়েদের অভাব ছিল না সমাজে।

উনিশ শতকে প্রকাশিত বৈষ্ণব গুরুদের কেচ্ছামূলক বইগুলো দেখলেই বোঝা যায়, এই সময়ের নতুন চেতনা সমাজের এক শ্রেনির মানুষদের একেবারেই স্পর্শ করেনি। প্রাগাধুনিক পর্ব অতিক্রম করে উনিশ শতকে এসেও নারী জীবনের সামাজিক বাস্তবতার তেমন পরিবর্তন হয়নি। এমনকি বিশ শতকেও ভাগ্যহত মেয়েরা বৈষ্ণব

গুরুদের আশ্রমে আশ্রয় খুঁজেছে, জীবন ধারণের বিকল্প ভুমির সন্ধান চালিয়ে গেছে। বিভিন্ন শতকের ভিন্ন ভিন্ন আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর সংকট অবশ্যই বহুমাত্রিক ও পরিবর্তনশীল।

আজও সমাজে ধনী শিক্ষিতা মেয়েরা যে সামাজিক মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা পায় দরিদ্র ঘরের মেয়েরা তা নিশ্চিত ভাবেই পায়না। অর্থ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্যকে তীব্র করে। যদিও আজকাল অনাথিনী, বিধবা মেয়েদের জন্য সরকারী হোম- এর ব্যবস্থা আছে। তবুও সে সুবিধা নিতে পারে কয়'জন মেয়ে? স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বিকল্প জীবনের সন্ধানে কোনো গুরুর আশ্রমে এসে পৌঁছায় এই সমস্ত ভাগ্যহত মেয়েরা। গ্রামে গঞ্জে বৈষ্ণবীয় আখড়া, আশ্রম, শ্রীপাটে এখনও সমাজ পরিত্যক্ত মেয়েদের ভীড়। তারা গুরুর সাধনার উপাচার হিসাবে নিজেদের তুলে দেয়। এ পথে কী সত্যিই শান্তির খোঁজ মেলে? এ নিয়ে বহু বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু এ জীবন যে নারীর কাছে সম্মানের নয় তা বোঝাই যায়।

কঠোর সামাজিক বিধান ও দারিদ্রতার চেহারাটা ঘুরে ফিরে একই রকম থেকে গেছে। প্রকাশ্যে নারী পাচার এখন আড়াল খুঁজে নিয়েছে। ধর্ষিতা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, অভিভাবক হীন মেয়েরা লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেতে বিকল্প জীবনে ডুব দেয় আজও। ভরার মেয়েদের মতই হয়তো তাদেরও স্মৃতি রোমন্থন চলে।, অন্য কোনো বারোমাসীর গান তৈরি হয়। তার সন্ধান আমরা শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা কতটুকুই বা রাখি?

> বৈধব্য সমাজে 'ডিমোশন' এখনও। পতির গর্বে সতীর অহঙ্কার। সে না থাকলে স্ত্রীর অস্তিত্ব কোথায়? কিংবা স্বামী যদি ত্যাগই করে তবে সে মেয়ে সংসারে কতটা কাঙ্ক্ষিত থাকে? দরিদ্র ঘরে এই মেয়েদের ভূমিকা থাকে কতটুকু? তারা শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়িতে গাছপালা, আসবাবপত্র, গরু-ছাগলের সঙ্গে মিশে থাকে অনুর মতো। আমাদের সমাজব্যবস্থায় যা কিছু প্রাপ্তি ধনী ও শিক্ষিতদের। দরিদ্র পরিবারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মেয়েটিকে সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। মেয়েটি পায়ে পায়ে আশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে এসে দাঁড়ায়। ভুঁই ফোঁড়ের মতো গজিয়ে ওঠা কোনও আশ্রমের গুরুর পায়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মধ্যে খোঁজে শান্তির পথ।[১৫]

এখন আর ব্যাপক ভাবে না হলেও সমাজের কিছু অংশে গ্রামে গঞ্জে এই বাস্তবতা বদল হয়নি। আশ্রমে, আখড়ায় এখনও মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিল্পের মধ্যে, গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে।

যে কোনো ধর্মেই পুরুষের সাধন পথে মেয়েরা শুধু ব্যবহৃত হয়। নারীরা সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ অথচ নারীদের নিজস্ব কোনো প্রাপ্তি নেই , অন্যের সহযোগিতা ও সাধন পথের সঙ্গী হিসাবে তাদের পরিচয়। কঠোর সামাজিক অনুশাসন মেয়েদের যে এই বিকল্প পথ দেখায় সেখানেও তো পুরুষেরই সর্বাত্মক প্রাধান্য। সম্প্রতি 'বোধিদ্রুম' নামে একটি নাটক লিখেছেন বাংলাদেশের নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া। সেখানে তিনি চর্যাপদের চরিত্রগুলির মধ্যে নতুন যুগ চেতনা ও দ্বন্দ্বের সঞ্চার করেছেন । বিনির্মাণের পথ দিয়ে যে নতুন নির্মাণে নাট্যকার পৌঁছেছেন সেখানে ব্যক্তি চেতনা থে কে জন্ম নেওয়া মেয়েদের প্রশ্নগুলো সাধন পথের এক ঝোঁকা নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ –

কুক্কুরীকে ডোম্বী তাদের সাধন পথে মেয়েদের অবহেলার দিকটাকে নির্দেশ করে বলে –

> যে পিপাসা একজনকে নিয়ে যায় তৃপ্তিতে – বোধিচিত্তে ... আরেক জনাকে ছুড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রণায় বেদনায়... সে কেমন পিপাসা বলো তো কুক্কুরী?[১৬]

আবার বঙ্কীকে সে প্রশ্ন করে –

> আমি কি কেবলই ওদের বোধিচিত্ত – মোক্ষের জন্য ব্যবহৃত হবো... [১৭]

এই প্রশ্ন সেই সমাজকে যা পুরুষের কর্মধারা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দেয় আর নারীকে তাদের উপযুক্ত সঙ্গী হতে বলে। নারীকে 'দেবী' বা 'মূল শক্তি'র তকমা এঁটে ভুলতে বাধ্য করে তাদের নিজস্ব সত্তাকে। যেন অন্যের কার্জ সিদ্ধির পথে বিলীন হয়ে যাওয়াতেই তাদের সার্থকতা। বিকল্প সমাজ ধারার, বিকল্প পথগুলো নারী পক্ষে কতটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত সেই প্রশ্ন আজও থেকে যায়।

সূত্র নির্দেশ ও মন্তব্য

১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ২৯২

২.. Risley H.H., *The Tribes and Castes of Bengal,* (Volume-2), Calcutta, Firma Mukhopadhayay, 1981, P. 344-45

৩. Ward W. , *Account of the writings, Religion and Manners of the Hindoos* (4, Vols), Serampore Printed at the Mission Press, 1811, P. 262

৪. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য –

দাশগুপ্ত শশিভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে,* কলিকাতা, এ. মুখার্জি এন্ড কোং লিঃ, ১৩৫৯, পৃ. ২৫১-২৬৪

৫. মজুমদার বিমানবিহারী, *শ্রী চৈতন্যচরিতের উপাদান*, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬, পৃ . ৫৭৯

৬. সেন সুকুমার (সম্পা.),*চৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা, সাহিত্য আকাদেমি, ২০০৯, পৃ. ৫*

৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য -

মুখোপাধ্যায় তুহিন , *চৈতন্য আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণবীয় বিবাহ বিচিত্রা* , কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১৮, পৃ. ১৫২-১৬০

৮. এ প্রসঙ্গে এক ঢাকাই বোষ্টমদের গানের উল্লেখ করেছেন রমাকান্ত চক্রবর্তী। গানটি হল –

পাঁচসিকার বৈষ্টুমী ধনি! তুই লো আমার

আরে তর মান বাড়াইমু কত আর।।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য –

চক্রবর্তী রমাকান্ত, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম,* চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃ. ১৪৩-১৪৯

৯. মৌলিক ক্ষিতিশ চন্দ্র, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৪র্থ খণ্ড) ফার্মা. কে. এল. মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৭-২২৩

১০. নন্দিতা বসু, 'ভরার মেয়ের সম্পর্কে দু'চারটি কথা', *পরশ তোমার : অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ,* মণ্ডল বিজয়কুমার (সম্পা.) , পুস্তক বিপণি, ২০১৩, পৃ. ৪১১-৪১৭

১১. মৌলিক ক্ষিতিশ চন্দ্র , *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৪র্থ খণ্ড), ফার্মাকে. এল. মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২০৩

১২. ঐ, পৃ. ২০৮

১৩. ঐ, পৃ.২০৯

১৪. "গানগুলির বিষয়, আর বারমাসী দেখে মনে হয়, এর রচয়িতা অজ্ঞাত পরিচয় অন্ত:পুরচারিকারাই"। - গিরি সত্যবতী , 'ভরার মেয়ের গান', কলকাতা, লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা , সনৎকুমার মিত্র (সম্পা.) ৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ. ২৬৯

১৫. চাকী লীনা, *বাউলের চরণ দাসী,* পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, গাঙচিল, ২০০৯, পৃ. ২৮

১৬. জাকারিয়া সাইমন , *নাটক সংগ্রহ,* 'বোধিদ্রুম', ঢাকা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ. ৮৪

১৭. ঐ, পৃ. ৭৯

Dr. Paramasree Dasgupta is an Assistant Professor at the Department of Bengali, Tripura University. She has done her PhD on Pre-modern Bengali Literature from Calcutta University.
Email : paramasreedasgupta@tripurauniv.in